ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 204-217
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.197

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আধুনিকতার রূপায়ন

মোঃ কয়েছ আহমেদ, *সিনিয়র প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ*

ড. কৃষ্ণা ভদ্র, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ*

Received: 26.08.2025; Accepted: 11.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Novels are the most popular branch of literature in modern times. The reason for this popularity comes from how the various diverse backgrounds of life can be depicted on the canvas of a novel. The life that the novel depicts is not a poetic thriller, not a dramatic scene but is rooted in real life. And, the reflection of the self-realization of novelists is the beginning of the modern novel. In the history of novels, Parichand Mitra to Bankim Chandra Chattopadhyay, RabindranathTagore, SaratChandra Chattopadhyay, Tarashankar Bandopadhyay, Vibhutibhushan Bandopadhyay, Manik Bandopadhyay are renowned novelists. These novelists have brought variety, modernity and reality to novels. The purpose of this article will be to expose the various aspects of modernity.

Keywords: Modernity, Novelist, Novel, Society, Religion, Classification of novels

ভূমিকা:

বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। যথা: প্রাচীনযুগ (৬৫০-১২০০) মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০) আধুনিকযুগ (১৮০১-বর্তমানকাল) প্রতিটি যুগের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে । প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক আর গতানুগতি সাহিত্যের ধারায় মানবতার বিষয় প্রত্যক্ষভাবে না এলেও পরোক্ষ ভাবে এসেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজ জীবনে দেখা যায়, মানুষের নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধ বা স্বাধীনসত্তার উপলব্ধি হারিয়ে সমাজের এবং ধর্মের শৃংখলিত নীতিবোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্যের নামে তখন স্বাভাবিক ভাবে প্রচারিত হয়েছে সমাজের নীতিবোধ এবং ধর্মীয় জীবনের মহিমা। মধ্যযুগের ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি নিষেধ থেকে মানবজীবনের মুক্তিলাভ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধিই মানুষকে আধুনিকযুগের প্রগতিবাদী চিন্তাচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে। মানুষ এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনসত্তার অনুসারী। মানুষ তার দোষ-গুণের মধ্যে দিয়ে তার মূল্যবান জীবনকে পরিস্ফূট করতে চায়। এই ব্যক্তিবোধ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি সম্ভব হয়। এই বোধ কেবল মাত্র উচ্চ শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রেই নয় বরং সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, দু:খ, দারিদ্র্যের মধ্যে ও জীবনের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসে তাই জীবন সম্পর্কে অতি সাধারণ মানুষের সামাজিক, ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক জীবন-প্রণালীর বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, রামায়ণ-মহাভারত কিংবা মঙ্গলকাব্যের ধারায় অথবা রোমান্টিক প্রণয়কাহিনীর অলৌকিকতা ও দৈবশক্তির বিকাশের মধ্যে ও কখনো কখনো সমাজচিত্রের ক্ষীণ ছায়া এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ, দু:খের ঘর কন্যার চিত্র লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে যথা 'কথাসরিৎসাগর', 'বেতালপঞ্চবিংশতি', দশকুমার রচিত 'কাদম্বরী' ইত্যাদির মধ্যেও উপন্যাসের

কিছুটা উপাদান লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ জাতকে, রামায়ণ, মহাভারতের রচয়িতারা যে রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তাও সমকালীন সাহিত্যের অভিনব শিল্প চেতনার নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে সুদক্ষ ঔপন্যাসিকের সমস্তগুণই বর্তমান ছিল। মুকুন্দরামের কাব্যে দেবতারা মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছেন। মুকুন্দরামের পাশাপাশি মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্যেও মানবতার জয়গান মুখরিত হয়েছে। এছাড়া ও পঞ্চদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় রচনার মধ্যে মানব-মানবীর প্রণয়, আবেগ, বিরহ, যন্ত্রনার চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছিল। আরাকান ও রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের যথার্থ মর্যাদা দান করা হয়েছিল। ঐ সময় মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের হাত ধরে আরবি, উর্দু, ফারসি, হিন্দি ভাষা থেকে অনুবাদিত হয়েছিল 'লাইলী মজনু', 'ইউসুফ-জোলেখা', 'সতী ময়না-লোর-চন্দ্রাণী', 'পদ্মাবতী', 'মধুমালতী', বাংলা সাহিত্যে ধর্ম- সংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয়োপাখ্যানের প্রথম সার্থক নিদর্শন রূপে দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঙালি মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালি মনে পাশ্চাত্য শিক্ষার রস আসাদ্বনের পাশাপাশি গদ্যের উৎপত্তি বিকাশ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা, মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে সংবাদপত্রের আর্বিভাব পাঠকের মনোরঞ্জন করে। পাঠকের মনে বাস্তবজীবনের এইসব সত্য বিশেষ ভাবে সংবেদনশীল হয়ে ধরা পরে। ''বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের মূলে যে চারটি স্বাধীনধারা কার্যকর হয়েছে সেগুলো হলো: (ক) অদ্ভুতরসাত্মক রূপকথা, (খ) ঐতিহাসিক কাহিনী, (গ) অনুবাদ মৌলিক নীতিকাহিনী এবং (ঘ) লোকরঞ্জক নকশা।"[১]

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথনাথ শর্ম্মন ছদ্মনামে নববাবু বিলাস প্রকাশ করেন। উপন্যাসের কিছু কিছু রেখাচিত্রে উজ্জ্বল। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স রচিত 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' নামে একটি কাহিনীর সাক্ষাত পাওয়া যায়। খ্রিস্টান ধর্মের বিষয় এর উপজীব্য। পরবতী পর্যায়ে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র আবির্ভাবে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ভবিষ্যত সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হয়। অবশ্য 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র তুলনায় 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বেশি উজ্জ্বল। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় কতগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টিমাত্র, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে ধারাবাহিক ভাবে কাহিনীর সাক্ষাত পাওয়া যায়। সেই হিসেবে 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের শক্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস সৃষ্টির ফলে এবং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বনফুল, প্রবোধ স্যান্যাল, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শহীদুল্লাহ কায়সার, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ ঔপন্যাসিকের আবির্ভাবের ফলে বাংলা উপন্যাসের একটি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হলে এখান থেকে পরিপূর্ণ ভাবে বিস্তার লাভ করে।

আধুনিক যুগে সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখা হচ্ছে উপন্যাস। এ জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হলো জীবনের বিভিন্ন পটভূমিকা চিত্রিত করা যায় উপন্যাসের ক্যানভাসে। উপন্যাসে যে বিস্তৃত জীবন চিত্রিত করে তা কোন কাব্যিক রোমাঞ্চ নয়, নাটকীয় দৃশ্য নয়, একটি বাস্তব জীবন। আর উপন্যাস যে দিন থেকে বাস্তবতাকে অবলম্বন করলো সেদিন থেকে উপন্যাসের আধুনিকতা শুরু। জীবনের জটিল বাস্তবতাকে অনন্ত জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা আধুনিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।

জীবনের জটিলতা সর্বকালে ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে এসে যান্ত্রিক মানুষের উগ্রস্বার্থবোধ এবং প্রখর সচেতনা তার মাঝে জাগিয়ে তোলে আত্মোপলব্ধি। এ আত্মোপলব্ধির ফলে মুহূর্তে তার মনোজগত ভাঙ্গন সৃষ্টির খেলা চলে। মুহূর্তে পাল্টে যায় মন, এ মুহূর্তে যা প্রিয়জন, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সে হয়ে উঠে শত্রু। এতো দ্রুত মন পরিবর্তনের ফলে আধুনিক মানুষের হৃদয় দ্বন্ধে বিক্ষত উগ্র মানুষটি ঘটিয়ে বসে অঘটন। চলে আসে আলোচনার শীর্ষবিন্দুতে। আধুনিক উপন্যাসে সে হয়ে যায় নায়ক আবার অনেক উপন্যাসে নায়ক হয় না রক্ত মাংসের মানুষ। সেখানে নায়ক হয় ইতিহাসের ঘটনা, মানুষের মতাদর্শ কিংবা সম্মিলিত চরিত্রগুলো।

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা:

এখন প্রশ্ন হলো সাহিত্যের আধুনিকতা বাধা পাচ্ছে কোথায়? তা কি মননে? চিন্তার সংকীর্ণতায়? আধুনিকতা তো কখনো কোন গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। দেশ-কাল-পাত্র ঊর্ধ্বে তার বিচরণ। একটা নির্দিষ্ট পরিবেশ তার পটভূমিকা হলে ও সে পরিবেশ বর্ণনা গুণে পরিচয় লাভ করবে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের যে কোনো জাতি আধুনিক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে খুঁজে পায় তার চেনা জগৎ থেকে। উৎকৃষ্ট আধুনিক উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় আত্মসচেতনতা। ধর্ম, সমাজ, প্রগতিশীল চেতনা, সাহস, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল অভিনব আঙ্গিক, নিত্য নতুন পরীক্ষণ আধুনিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলেও সেখানে উপন্যাসিককে হতে হয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দার্শনিক। ইতিহাসের সূক্ষ্ম বিশ্লেষক, জনজীবনের ব্যর্থতার মূলবীজ কোথায় নিহিত তার আবিষ্কারক হলেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাস-শিল্পকে বিকাশের শীর্ষ স্তরে পৌঁছে দেয় এবং মহৎ উপন্যাস পাঠকের মনকে যুক্ত করে বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের সঙ্গে। উপন্যাসের প্রধান উপাদান মানুষের জীবন তাই উপন্যাসের কাহিনী হয় বিশ্লেষণাত্মাক দীর্ঘ ও সমগ্রতা সন্ধানী। সামাজিক সমস্যার মূল স্রোতের অনুসন্ধিৎসু গবেষক। পাঠক বা সমাজের মানুষকে সমাজ জীবনের চাহিদা, মানুষের ক্রিয়াকলাপ, মানসিক জটিলতা সবকিছু শৈল্পিক দৃষ্টি উপস্থাপন করেন পাঠক সমাজ। সেই চিত্রময়তা ভেতরে সমাজের অসংঙ্গতি বিষয়ক সমাধান ও করে থাকেন। তার-ই বিশ্লেষণ এবং অন্বেষণ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা:

বিষয় পরিধি ব্যাপ্তি আলোকে গবেষণাটি সময় কাল একই ফ্রেমে চিত্রপট উপস্থাপিত করা কষ্টসাধ্য। তবু ও প্রণিধান যোগ্য।

গবেষণার হাইপোথিসি:

সমাজ জীবনের মূল্যবোধের প্রেক্ষাপট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

ঔপন্যাসিকদের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বিশ্লেষণ: প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪- ১৮৮৩) বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণে এবং বিবর্তনের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্র উচ্চার্য নাম। উনবিংশ শতাব্দীর জীবন রূপের প্রথম ব্যঙ্গচিত্র রচয়িতা, জীবনানুসারী গদ্যরীতির প্রথম প্রবর্তক। তেমনি তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক হিসেবে ঐতিহাসিক মর্যাদায় স্মর্তব্য। উনিশ শতকের রেনেসাঁসে ভারতবর্ষের সাহিত্য জগতে ও পরিবর্তন এনেছিল। এ সময়ে পরিবেশ ছিল মানবতার জয়গানে মুখরিত। তখনই উচ্চবিত্তের হাত থেকে বিদ্যা ও বিত্ত চলে গিয়েছিল অধিকারীদের হাতে। প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন সেই সময়ে অন্যতম রেনেসাঁসের সংগঠক। তিনি ছিলেন প্রগতিপন্থী অধ্যাপক ডিরোজিওর ছাত্র। সেই সময়ে ধনীদের আচরণ হয়ে উঠেছিল উচ্ছৃঙ্খলতা আর্বতে নিমজ্জিত। আর সমাজকে অবক্ষয়ী পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ১৮৫৮ সালে তিনি লিখেছিলেন উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'। সেই থেকে সূচিত হলো বাংলা সাহিত্যের সার্থক উপন্যাসের ধারা। তিনি রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় মহিলাদের 'হিতকরী' (১৮৫৪) মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। এ পত্রিকায় 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার তাঁর কৃতিত্বের জন্য পাদ্রী লঙ তাঁকে 'ডিফেন্স অব বেঙ্গল' অভিধায় ভূষিত করেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৯৫৯) 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১) 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫) 'অভেদী' (১৮৭১) 'ডেভিড হেয়ার জীবন চরিত' (১৮৭৮) 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থায়' (১৮৭৮) 'আধ্যায়িকা' (১৮৮০) ও 'বামাতোষিণী' (১৮৮১) প্রতিটি উপন্যাসে সংকীর্ণ চিন্তা চেতনার প্রকাশ পেয়েছে। সব উপন্যাসেই অনেকটা বৈচিত্রতা এসেছে।

আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসের কাহিনি: অতি আদরের ধনীর পুত্র মতিলাল। ধর্ম, নীতিশিক্ষা কখনো পায়নি। সঙ্গদোষে অবনতি শেষ ধাপে। অন্যদিকে মতিলালের ছোট ভাই রামলাল আদর্শ চরিত্র বরদাবাবু সান্নিধ্যে থেকে তাঁর নির্দেশ মান্য করে সবর প্রশংসা অর্জন করেছে। মতিলালের চৈতন্যোদয় এবং আদর্শ জীবনের প্রতি আকর্ষণে গ্রন্থের সমাপ্তি। গ্রন্থের এই প্রধান ঘটনাস্রোত বিচিত্র খণ্ড ক্ষুদ্র পল্লবিত ঘটনাই গ্রন্থটির আশ্চর্য সফলতার কারণ। বস্তুত বরদা বাবুর মত প্রত্যক্ষ নীতিবিদ, বেনীবাবুর মত সজ্জন অথবা আদর্শ যুবক রামলাল এরা আলালের অবিস্মরণীয় সাফল্য

এনে দিয়েছে। মতিলাল স্বয়ং এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ হলধর, গদাধর ইত্যাদি ধড়িবাজ, মুৎসুদ্দি বাঞ্ছারাম, শিক্ষক বক্রেশ্বর বাবু এবং সর্বোপরি একটি অপূর্ব সৃষ্টি ঠকচাচা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সম্পর্কেই তাঁর তীক্ষ্ণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। এ উপন্যাসটিতে কলকাতা অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা তথা কথ্যভাষার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ভাষাটি 'আলালী ভাষা' হিসেবে সুপরিচিত। এই ভাষার ব্যাপক পরিমানে আরবি- ফারসি শব্দের ব্যবহার ঘটেছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো ঠকচাচা, ঠকচাচী, মতিলাল, বাবুরাম বাবু, বাঞ্ছারাম বাবু প্রমুখ।

প্যারীচাঁদ মিত্রের উপন্যাসের অভিমত:

ক. উপন্যাসের নায়ক আলালের বাস্তবতা রূপটি গভীর ভাবে ফুটে উঠেছে যে বাস্তবনিষ্ঠতার কারণে বাংলা সাহিত্য তাঁর অবদান অতুলনীয়।

খ. প্যারীচাঁদ মিত্র সমাজচিত্র অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত ।

গ. তিনি একদিকে যেমন রঙ্গ পরিহাসের উত্তরোল ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করে পাঠককে বেসামাল করে তুলেছেন, আবার অন্যদিকে সমাজ ও ব্যক্তির জীবন নীতি, উচ্চতর চরিত্র ধর্ম প্রভৃতি নৈতিক ব্যাপার নিয়েও খুব গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়েছেন।

ঘ. উপন্যাসোচিত একটি সমস্যার প্রথম সাক্ষাত পাওয়া গেল তাঁর রচনায়।

ঙ. একটি বিস্তৃত দেশজ জীবনপটের, প্রকৃতি এবং মানুষের প্রথম ব্যবহার এখানে পাওয়া গেলো।

চ. ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত সর্বগ্রাহী মনের প্রথম পরিচয় এই রচনায় মিলল।

ছ. সর্বোপরি জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা মানসদৃষ্টির সাক্ষাৎ প্রথম এই রচনায় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক শিল্পী। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্বদ্যিালযের প্রথম গ্রাজুয়েট। তিনি প্রথমে Rajmohan's wife (1862) ইংরেজি উপন্যাস লিখে তৃপ্ত হয়নি। তিনি বাংলা উপন্যাস লিখায় আত্মোনিয়োগ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার মাধ্যমে একদিকে যেমন তাঁর মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথের সন্ধান পেলেন। তেমনি বাঙালির মন এক অভিনব সাহিত্য শিল্পের রসস্বাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বাইশ বছরে চৌদ্দটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। যথা: 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৬) 'কপাল কুণ্ডলা' (১৮৬৬) 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) 'রাধারাণী' (১৮৭৫) 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) 'রজনী' (১৮৭৭) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) 'রাজসিংহ' (১৮৮১) 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭) খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে উড়িষ্যাধিকার নিয়ে মোঘল ও পাঠানদের মধ্যে যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তা -ই 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। উপন্যাসে যুদ্ধ বিগ্রহের কলকোলাহলের স্থান দেয়া হলেও এতে প্রেমের সূচনা, বিকাশ, পরিণতি ফুটে উঠেছে। প্রধান চরিত্র হল– বিমলা, আয়েশা, জগৎসিংহ, তিলোত্তমা।

এয়োদশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের কাহিনি 'মৃণালিনী' উপন্যাসের উপজীব্য। তাঁর এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার চেয়ে ঔপন্যাসিকের কল্পনাশ্রয়ী মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে বেশি। প্রধান চরিত্র হলো– হেমচন্দ্র, মৃণালিনী, পশুপতি, মনোরমা। সামাজিক উপন্যাস 'কপালকুন্ডলা'য় সামাজিকতার তুলনায় নায়িকার অন্তপ্রকৃতির রহস্য উদঘাটনই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। প্রধান চরিত্র হলো কপালকুন্ডলা, মতিবিবি, নবকুমার, কাপালিক প্রমুখ। এ উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা এমন এক চরিত্র, যে যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত বনে বড় হয়েছে, লোকালয় বা সমাজ দেখেনি। বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ'। রাজস্থানের চঞ্চলকুমারীকে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব বিবাহ করেন। এ কারণে রাজসিংহের বিরোধ এবং বিরোধের ফলে রাজসিংহের জয় ও চঞ্চলকুমারী লাভ। এ ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাসটি পরিকল্পিত। তাছাড়া জেবুন্নেসা- মবারক-দরিয়া বিবির একটি কাল্পনিক ঘটনাও চিত্রিত হয়েছে।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের পটভূমিকা ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং মীর কাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংগ্রাম। এতে সঙ্গে ইতিহাসশ্রয়ী ঘটনার গার্হস্থ্য জীবন কাহিনির সংমিশ্রণ। উপন্যাসের একদিকে যেমন চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনির স্থান পেয়েছে, অন্যদিকে মীর কাসিম-দলনী বেগমের কাহিনি রূপায়িত হয়েছে। ফলে এ দুটি

কাহিনির একত্র সম্মিলন উপন্যাসটিতে লক্ষণীয়। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হল : একজন সাধারণ মেয়ে প্রফুল্ল কীভাবে অত্যাচারিত হয়ে দেবী চৌধুরানী রূপে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং জমিদার হয়ে প্রজাদের সেবা করেন। এই উপন্যাসে একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসনের বিরোধীতা ও সংগ্রামের চিত্র আছে, তেমনি মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও নারীর ক্ষমতায়নের দিকটি ও তুলে ধরা হয়েছে। 'সীতা রাম' উপন্যাসে শুদ্র সামন্ত রাজ্যের উত্থান পতন, পারিবারিক জীবনের সমস্যা এবং বিপর্যস্ত ব্যক্তি চরিত্রের সমাবেশ। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী নামে বাল্যবিধবার প্রতি ধনাঢ্য ভূস্বামী নগেন্দ্রনাথের আর্কষণ ও আত্মসমর্পণ, নগেন্দ্রপত্মী সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন এবং অন্তে কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা- এটি এ উপন্যাসের মূল কাহিনি। সমসাময়িক পারিবারিক জীবনের ওপর ভিত্তি করে রচিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে চিত্ত সংযমে অনিচ্ছা বা অক্ষমতা থেকে স্ত্রী পুরুষের শোচনীয় পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। রোহিনী, গোবিন্দলাল, ভ্রমর এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' কালে বাঙালি জীবনের বিপর্যয় এবং উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নিয়ে রচিত 'আনন্দমঠ'। উপন্যাসে বঙ্কিম তাঁর 'বন্দে মাতরম' সংগীতটি সংযোজন করেছেন। এ গ্রন্থটি এবং গানটি উত্তরকালে বিপ্লবী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান প্রণোদনা হয়ে দাঁড়ায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের অভিমত।

ক. হিন্দুয়ানী আদর্শ রূপায়ণে উদ্যোগী।

খ. সাম্প্রদায়িক বঙ্কিম মুসলিম চরিত্রকে নিন্দার চোখে দেখেছেন।

গ. শিল্পী বঙ্কিম নীতিবাদী বঙ্কিমের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সাফল্যতা: বঙ্কিম উপন্যাসে তৎসম, তদ্ভব, শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি প্রচুর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিম উপন্যাসের মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের জীবন সংঘাত, মহৎ প্রকৃতির তীব্র অর্ন্তদ্বন্দ্বের মহিমা উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁকে তাঁর সময়কালের আধুনিক ও প্রগতিশীল ঔপন্যাসিক বলা হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৬) অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংকীর্ণ মনোবৃত্তি অতিক্রম করে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় সংযোজন করেছেন। তিনি বাঙালির জীবনের উপেক্ষিত বৈশিষ্ট্য চিত্রিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসের প্রধান শক্তি হলো জীবনপ্রেম ও মানবিক অনুভূতি এবং মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা। যা তিনি সহজ রূপে রূপায়িত করেছেন। তাঁর উপন্যাস গুলো চরিত্র প্রধান। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষদের রক্তধারার মধ্যে বৈরাগ্যভাব বর্তমান ছিল, যার ফলে তার রক্তের মধ্যে সেই ধারা অব্যাহত ছিল। এর ফলে জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি সন্ন্যাসীবেশে ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করেছেন। তাঁর কর্ম জীবনে প্রথমে তিনি বার্মা বর্তমান মায়ানমার যান। সেখানে থাকাকালীন তাঁর প্রথম গল্প 'মন্দির' (১৯০৫) প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে মন্দির গল্পটি কুন্তলীন পুরষ্কারে ভূষিত হয়। তাঁর দ্বিতীয়গল্প 'বড়দিদি' ভারতী নামক সাহিত্য পত্রিকায় ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একের পর এক সাহিত্য বাঙালিদের উপহার দেন। শরৎচন্দ্র স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন "অন্যান্য গ্রন্থকারদের যা নিয়ে বিপদ প্লট পায় না, সেই প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নেই, তাহাদিগকে ফোটাইবার জন্য যাহা দরকার হয়, তাহা আপনিই আসিয়া পড়ে। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র তাকে ফোটাইবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়।"[২]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ্যযোগ্য উপন্যাস হলো: 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'বিরাজবৌ' (১৯১৪), 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪), 'পরিণীতা' (১৯১৪), 'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৪), 'মেজদিদি' (১৯১৫), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'বৈকণ্ঠের উইল' (১৯১৬), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব ১৯১৭, দ্বিতীয় পর্ব ১৯১৮, তৃতীয় পর্ব ১৯২৭, চতুর্থ পর্ব ১৯৩৩), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭), 'কাশীনাথ' (১৯১৭), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'স্বামী' (১৯১৮), 'দত্তা' (১৯১৮), 'ছবি' (১৯২০) 'গৃহদাহ' (১৯২২), 'দেনা পাওনা' (১৯২৩), 'পথের দাবী' (১৯২৬), 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫) ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে মৌল সত্তাকে আলোকিত করে নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি প্রেমের বিচিত্র রহস্য উদঘাটনে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর লেখনীতে নারী হৃদয়ের দুর্বার ভালবাসা, প্রত্যাখান - দুই দিক ই তাঁর উপন্যাসে বর্তমান। 'দেবদাস' উপন্যাসে পার্বতী, 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে ষোড়শী, 'বড়দিদি'র মাধবী– প্রভৃতি চরিত্র নারী হৃদয়ের প্রবৃত্তির সঙ্গে সমাজ ও প্রচলিত সংস্কারের দ্বন্দ্বই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে প্রেম সতীত্বের চেয়ে ও মহত্তর তা বিশ্বাস করতেন। সমাজ জীবনে কত বিপুল রহস্য যে লুকিয়ে ছিল শরৎচন্দ্র তাঁর চরিত্রচিত্রণে উপভোগ্য রূপে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস– 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত' 'গৃহদাহ'। আবার অন্যদিকে তাঁর উপন্যাসে প্রেমবর্জিত পারিবারিক বিরোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি', 'মামলার ফল', 'নিষ্কৃতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'একাদশী বৈরাগী' ইত্যাদি। স্বাভাবিক নর-নারীর প্রেমের চিত্র, সামাজিক বিধিনিষেধ অনুবর্তী শরৎচন্দ্রের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। 'চন্দ্রনাথ', 'পণ্ডিতমশাই', 'স্বামী', 'শুভদা' উপন্যাসে তা পরিলক্ষিত হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সীমাবদ্ধতা:

১. রচনারীতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও তাঁর স্বকীয়তা সহজে স্বীকার্য।

২. কখনো কখনো রচিত উপন্যাস আত্ম কাহিনির মতো মনে হয়।

৩. শরৎচন্দ্র এমন এক প্রকারে প্রেমের বৈশিষ্ট্য যা বাঙালি সমাজে অননুমোদিত বলা চলে।

৪. প্রাঞ্জলতা, সহজবোধ্যতা ও মাধুর্য শরৎচন্দ্রের ভাষার বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসগুলো পাঠক উপভোগ্য।

৫.নারী জাতির দু:খ দুর্দশা শরৎচন্দ্রের মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। তাঁর একক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছে। সাহিত্যের বৈচিত্র্যধর্মী শাখা-প্রশাখায় তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার স্বচ্ছন্দ বিকাশ ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র উপন্যাসে আমরা প্রথম পেলাম জীবনের আধুনিক প্রকাশভঙ্গি। তাঁর চরিত্র সৃষ্টি বঙ্কিম থেকে ব্যতিক্রম। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব আছে বলেই নিজেরা চলতে পারে। চরিত্রগুলির কবিত্বময় কথার ঢংঙে জীবন জটিলতার বিচ্ছুরণ ঘটে। চরিত্রগুলোর অধিকার সচেতন। কিন্তু আধুনিকতার সামগ্রিকতা রবীন্দ্র উপন্যাসেও অনুপস্থিত। "যদিও বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার সূত্রপাত ও তাঁরই হাতে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছতে গেলে রবীন্দ্রনাথকেই যাত্রারম্ভের চিহ্ন হিসাবে ধরে নিতে হয়।"[৩] রবীন্দ্রনাথ রচিত উপন্যাসের সংখ্যা মোট ১২টি। সেগুলো হলো: 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭), 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬), 'গোরা' (১৯০৯), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'দুই বোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' (১৯৩৩), ' চার অধ্যায়' (১৯৩৪) । রবীন্দ্র-পরবর্তী উপন্যাস ঘটনা সর্বস্য ছিল। গল্প প্রধান উপন্যাস হিসেবে 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ' ও রাজর্ষি তার প্রমাণ মিলে। 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট'-এবং 'রাজর্ষি' উপন্যাস দু'টির ঘটনা যেমন প্রথাবদ্ধ নিয়মের অনুসরণ, তেমনি চরিত্রগুলোও নিছক একটি তত্ত্ব বা ভাবের বাহন মাত্র, ফলে বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ নয়। দু'টি উপন্যাসই ইতিহাসকে অবলম্বন করে রচিত। কিন্তু ঘটনা কিংবা চরিত্রের উপর ইতিহাস তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। প্রতাপাদিত্য কিংবা বসন্ত রায়, গোবিন্দমাণিক্য কিংবা রঘুপতি এরা প্রত্যেকেই একএকটা তত্ত্বের বাহন হিসেবে কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-সমস্যা-প্রধান উপন্যাস হিসেবে 'চোখের বালি' (১৯০৩) এবং 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে 'চোখের বালি'র সৃষ্টি একটি নতুন দিকের সূচনা করে। 'চোখের বালি' উপন্যাসে চারটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী, ও আশা-এদের জীবনকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা আর্বত সৃষ্টি হয়েছে, তার সমস্যা এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। মহেন্দ্র এবং বিনোদিনীর চিত্তের দ্বন্দ্বেই উপন্যাসের ঘটনা স্রোতকে জটিলতার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। এই সমস্যাকে জটিলতর করেছে আশা ও বিহারীর উপস্থাপনা। চারজনের এই জটিল ঘটনা সমস্যার মধ্যে জড়িত হয় রাজলক্ষী এবং অন্নপূর্ণা। বিধবা বিনোদিনী যেভাবে মহেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং প্রেমের একটি আর্দশ রক্ষা করবার প্রয়াস পায়। পুত্রবধূর প্রতি বিদ্বেষবশত রাজলক্ষী মহেন্দ্র

এবং বিনোদিনীর অবৈধ প্রণয়কে প্রশ্রয় দেয়। এইভাবে উপন্যাসে চারজনের মনের জটিল প্রক্রিয়া নিজেদের চরিত্রসৃষ্টিতে যেমন সহায়তা করেছে, তেমনি ঘটনার অগ্রগতিতেও কার্যকর হয়েছে।

কাল গণনায় 'নৌকাডুবি' খাপ ছাড়া কাহিনি নির্ভর। তাতে আছে রমেশ কমলার জটিল সম্বন্ধ। আকস্মিকতা হলো রমেশের বউ বদল। মালা ও নলিনাক্ষের পুর্নমিলনও প্রায় দেবঘটনা। কোথাও কোন গভীর ও জটিল আলোড়ন নেই। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রোমান্টি মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'গোরা' (১৯০৯) উপন্যাসখানি প্রসার ও পরিধির দিক দিয়েই শুধু নয়, বিবিধ বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে আছে। গোরা নিজের পরিচয় অবগত হয়ে না হয়ে হিন্দু হিসেবে নিজেকে মনে করে এবং হিন্দুসমাজ রক্ষণে আত্মনিয়োগ করে। তার সামাজিকতা হিন্দুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত মহাকল্যাণের ওপর নয়। পরে নিজের প্রকৃত পরিচয় অবগত হয়ে মতের পরিবর্তন ঘটালে ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি তাঁর আপন হয়ে ওঠে। ধর্মবিপ্লবের সমস্ত একাগ্রতা ও উদ্দীপনা এই উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে। গোরা বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত একমাত্র উপন্যাস যা শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের রূপ গ্রহণ করেছে। এ উপন্যাসে বৃহত্তর অর্থে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আদর্শের সাথে স্ত্রী ও পুরুষের ব্যক্তিগত সংযোগের অবস্থান নিয়ে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসটি বঙ্গভঙ্গের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে দেশাত্মবোধ মুক্তিলাভ করেছিল। উচ্চ মধ্যবিত্ত এই দেশাত্মবোধের নাম করে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের যে ঘৃণ্য প্রক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল, তারই বৃত্তান্ত উপন্যাসটিতে। রাজনীতি ও সমাজনীতি এই দুই মিলে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি রচিত। বিমলা, নিখিলেশ, সন্দীপ, প্রমুখ চরিত্রের সমন্বয়ে লিখিত হয়েছে উপন্যাসটি।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটিতে জ্যাঠা মহাশয়, শচীন, দামিনী ও শ্রীবিলাস এই চারটি চরিত্রের গল্প মিলে উপন্যাসটি। এ উপন্যাস রসোপলব্ধি বুদ্ধি সাধন উপন্যাস।'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের মতবাদ প্রধান উপন্যাস। এতে শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাশ, ও নাস্তিক জ্যাঠামশায় এই ক'টি চরিত্র উল্লেখ যোগ্য। শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাশের প্রণয় কাহিনী কিছুটা অস্পষ্ট। দামিনী শচীশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, কিন্তু শচীশের দেয়া প্রেমের ঐশ্বর্য ও যৌতুক নিয়ে অবশেষে শ্রীবিলাশকে বিয়ে করে, ঘটনা-বিন্যাস ও যুক্তি পারম্পর্যের ভিতর দিয়ে তা বর্ণিত হওয়ার অবকাশ পায় না।

'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য মধুসূদন ও কুমুদিনীর দাম্পত্য-জীবনের নানা সংঘাতময় ঘটনা। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র দাসী শ্যামা, সে স্থুল ভোগবাসনার মধ্যেই নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে মধুসূন-কুমুদিনী চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র খুবই সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। তারা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী, হলেও তাদের চরিত্রের বৈপরীত্য ঘটনার স্তরগুলো অতি নিপুণভাবে সাধিত হয়েছে।

'শেষের কবিতা' (১৯৩০) উপন্যাসটি তিরিশের যুগের তরুণ সাহিত্যিকদের, যাঁরা একসময় কোমর বেঁধে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরোধিতায় লেগেছিলেন তাঁদেরকে আকস্মিকভাবে আঘাত করেও বিস্মিত, চকিত ও প্রভাবিত করেছিল। 'শেষের কবিতা'য় অমিত-লাবণ্য-শোভনলাল-কেটি চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে প্রেমের বিশেষ তত্ত্ব প্রচার করেছেন। 'শেষের কবিতা'র বিষয়বস্তু উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের চারটি শিক্ষিত নরনারী প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত। অমিত লাবণ্যের প্রণয় আকাশবিহারী, কিন্তু পরিণামে তারা বুঝেছে তাদের কল্পলোকের প্রণয় ধুলোমলিন পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবার অনিবার্য ক্ষণটুকুর জন্য অপেক্ষা করছে, তাই তারা তাদের এই রোমান্টিক প্রণয়কে বাস্তব জগতের ধুলোর স্পর্শ থেকে বাঁচাবার জন্য 'কবিতার মাধ্যমে পরস্পরের কাছে বিদায়-লিপি পাঠিয়েছে।

'দুইবোন', 'মালঞ্চ' উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় দুইবোন। উপন্যাসটিতে ত্রিভুজ প্রণয়। অসুস্থ বোন শর্মিলা ও সেবা করতে এসে ঊর্মি ভগ্নিপতি শশাঙ্কের প্রেমে পড়ে। মৃত্যু পথযাত্রী শর্মি তার স্বামীর হাতে উর্মিকে তুলে দেয়। আর মালঞ্চ উপন্যাসে যৌবন- উত্তীর্ণ বয়স্ক পুরুষের চিত্তে বিয়ে বহির্ভূত সরল প্রণয়লীলা এবং বিচিত্র উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। জীবনের যে একটা স্বভাব-নিষ্ঠুর দিক আছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে 'দুইবোন' এবং 'মালঞ্চ' উপন্যাসে।

'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসেও প্রেমের সঙ্গে বিপ্লবাদের একটা সম্বন্ধ রক্ষা করা হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক অতীন যে বিপ্লবাদের দিকে প্রলুব্ধ হয়েছে তাকে ভারতের মুক্তি কামনায় বলা ঠিক হবে না, বরং এলার প্রতি তার আকর্ষণই তার উপজীব্য। ইন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে এলা বিপ্লবাদে দীক্ষা নেয়, কিন্তু ইন্দ্রনাথ অতীনের তুলনায় অনেক দুর্বল। অতীনের নেতৃত্বই উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করেছে, সেই তুলনায় তার ব্যক্তিমনের পরিচয় প্রায় নেই বলেই চলে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাস জগতে অনন্য ও বৈশিষ্ট্য শিল্পকর্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসের সীমাবদ্ধতা: "রবীন্দ্র উপন্যাসের জনপ্রিয়তা মাঝামাঝি। কিন্তু অন্ততপক্ষে একটি 'চতুরঙ্গ' সর্বাঙ্গীন সুন্দর আধুনিক উপন্যাস হিসাবে সমালোচকের দৃষ্টি কাড়ে। এ উপন্যাসের রবীন্দ্র বয়সকে স্বীকার করে এগিয়ে যান অনেকদূর। কিন্তু আধুনিকতায় রবীন্দ্র উপন্যাসের কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। এ সীমাবদ্ধতার হলো সমাজের বৃহৎগোষ্ঠী অর্থাৎ মেহনতী, নির্যাতিত, জীবন যুদ্ধে সম্ভব সংগ্রামী মানুষ, বস্তির নোংরা পরিবেশ, দেহ-পসারিণী, সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় শোষণ, অর্থনৈতিক নির্মম বাস্তবতা তাঁর উপন্যাসে প্রায় অনুপস্থিত। রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হয় অভিজাত শ্রেণী কিংবা তাঁর এক ধাপ নিচের মধ্যবিত্ত। তৎকালীন সমাজে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রবীন্দ্র উপন্যাসে স্থান করে নিতে পারেন নি।[৪]

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সফলতা: বিষয়ের অভিনবত্ব, বক্তব্যের তির্যকতা, চারিত্রিক দ্বন্ধ সৃষ্টিতে সফল শিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা:

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৪- ১৯৫০) মানুষের সুখ-দু:খ এবং প্রকৃতির রঙ-রূপ চিত্রণে তাঁর উপন্যাসের বিশেষত্ব। তাঁর উপন্যাস হলো- 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯), 'অপরাজিতা' (১৯৩২) 'দৃষ্টি প্রদীপ' (১৯৩৫), 'আরণ্যক' (১৯৩৮), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'ইছামতী' (১৯৫০)। বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জীবনের যথার্থ এপিক 'পথের পাঁচালী'। অপু , দূর্গা, হরিহর, সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকুরুণ। অপু চরিত্রের ক্রম বিকাশ ও পরিণতি এবং নিশ্চিন্তপুর গ্রামে তার শৈশব আর কৈশোর জীবন বয়ে চলা- জীবনের চিরন্তন এ রীতিই ঔপন্যাসিক সাধারণ শিল্পরূপের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন।

অশনি সংকেত:

এ উপন্যাসটি ১৯৪৪-১৯৪৬ এর মধ্যে লেখা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিষময় ফল ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস গ্রাম বাংলায় কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে তারই নিঁখুত বর্ণনা রয়েছে অশনি সংকেত উপন্যাসে। অতিরিক্ত মুনাফা লোভে বাঙালি কৃষিজীবীরা কেমন হন্যে হয়ে উঠেছিল তারও জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সত্যজিৎ রায় এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন।আরণ্যক উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের একটি ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস। মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক 'অপরাজিতা' ও 'আরণ্যক' বাংলা সাহিত্যে অনন্য অবদান।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৭১) মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সমসাময়িক অন্য একজন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। ১৯৫৯ সালে মাদ্রাজে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে তারাশঙ্কর সভাপতির ভাষণে বলেন, "… The sprit of writer is th song of freedom, we have faught against imperialism and colonialism and will continue tofight aganst all injustice and wong to humanity social and political, against all aggression of lifein any form."[৫]

মানিকের সাথে তারাশঙ্করের ব্যতিক্রম এখানে, তারাশঙ্করের বেশী ভাগ রচনায় গোষ্ঠী বা দল চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠে। তিনি রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে সামনতান্ত্রিক ব্যক্তির জীবন ও সমাজের ছবিটি অপূর্ব করুণায় ও মমতায় বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো: 'ধাত্রী দেবতা' (১৯৩৯) 'গণ দেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩) 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪০) 'কবি' (১৯৪৪) 'রাইকমল'(১৯৩৪) 'কালিন্দী' (১৯৪০) তারাশঙ্করের উপন্যাস বিজ্ঞানীয় তত্ত্ব সম্পর্কীয়। তাতে ধনতন্ত্র উদ্ভব হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিলীন-পরিণতি, জমিদারতন্ত্রের ভগ্নদশা, ঈশ্বরে অস্তিত্ববোধে প্রগাঢ় বিশ্বাস, মার্কসীয় সাম্যবাদের সাথে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক দ্বন্ধ, হিন্দু-মুসলিম ধর্মের আলোকে

প্রেম ও সমাজ জীবন, ফ্রয়ডীয় দর্শন, বর্ণবাদ, অন্ত্যজশ্রেণীর জীবন-বীক্ষণ, অরণ্য- আকীর্ণ অঞ্চলের জন জাতির জীবন যাপন পদ্ধতি, শহর কলকাতার নাগরিক জীবন-সংকট ইত্যাদি বহুমুখী বিষয়ে তারাশঙ্করের জীবন দর্শন নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সত্যিকার উৎকর্ষ ও বিকাশ মানিক বন্দোপাধ্যায়ের (১৯০৮- ১৯৫৬) হাত ধরে। তিনি একজন ভারতীয় বাঙালি কথা সাহিত্যিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে মানবিক মূল্যবোধের সংকটময় মুহূর্তে বাংলা কথাসাহিত্যে যে কয়েকজন লেখকের হাতে সাহিত্য জগতে বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয়েছিল মানিক বন্দোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তি ইত্যাদি। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যা তার রচনায় ফুটে উঠেছে। তিনি চল্লিশটি উপন্যাস ও তিনশত ছোট গল্প রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'দিবা রাত্রির কাব্য' উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে: 'জননী', 'শহরতলী', 'শহরবাসের ইতিকথা', 'চতুষ্কোণ', 'অহিংসা', 'সোনার চেয়ে ও দামী', 'হরফ', 'ইতিকথার পরের কথা', 'পরাধীন প্রেম', 'হলুদ নদী সবুজ বন' ইত্যাদি।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ উপন্যাসের কাহিনী বিশ্লেষিত। তবুও ভাববাদের মোহ মুক্ত হতে পারেনি। গাওদিয়া গ্রামের গোপালের একমাত্র ছেলে শশী কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাস করেছে। শহর থেকে গ্রামে ফেরার পথে বজ্রপাতে নিহত হারুকে নৌকায় করে নিয়ে এসে সে সৎকারের ব্যবস্থা করে। পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে এভাবে একজন ডাক্তারের আবির্ভাব ঘটে। এ উপন্যাসটি লাশ সৎকারের মতো কর্তব্য কাজ ও মানবিকতার উজ্জ্বল পটভূমিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই মানিক বন্দোপাধ্যায় শশীর দুই বিপরীত স্বরূপের কথা আমাদের জানিয়ে দেন: "শশীর চরিত্রে দুইটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগও রসবোধের অভাব নাই, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসরিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতা ও তাহার যথেষ্ট। তার কল্পনাময় অংশটুকু গোপন ও মূক। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাহার সাথে না মিশিলে এ কথা কেহ টের পাইবে না যে, তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার-পদ্ধতি আছে। তাহার বুদ্ধি, সংযম ও হিসাবই প্রকৃতির পরিচয় মানুষ সাধারণত পায়। সংসারে টিকিবার জন্য দরকারি এই গুণগুলির জন্য শশীকে সকলে ভয় ও খাতির করিয়া চলে। উপন্যাসটি গ্রামের ডাক্তার শশী, শশীর পিতা ও কুসুম। তাদের অন্ত:দ্বন্ধও প্রেমই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।"[৬]

'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) কুবের, কপিলা ও হোসেন মাঝি নিঃসন্দেহে উপন্যাসের তিন শক্তিশালী চরিত্র এবং এদেরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের পাঠ। 'পদ্মা নদীর মাঝি'তে নদীপথের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেই জনপদের আর্থ- সামাজিক পরিস্থিতি ন্যূনতম সীমা অতিক্রম করে দারিদ্র্যের চরমসীমা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটিতে কুবের, কপিলা ও হোসেন মিয়া এই উপন্যাসের বিস্তৃত জায়গা দখল করে নিলেও রাসু, যুগল, যুগী, গোপী, শীতল, পীতম, নকুল, সিধু, ধনঞ্জয়, হীরু, আমিনুদ্ধি, শ্যামাদাস, এনায়েত এবং অপ্রত্যক্ষ মেজকর্তা উপন্যাসের জীবন- বাস্তবতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে উপস্থিত। মেজকর্তা যুগল ও শ্যামাদাস ছাড়া অন্যান্যরা জেলে পাড়ার বাসিন্দা। জীবন-যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের একেবারে মিলন- সীমান্তে এদের বসবাস। কুবের ও মালার দাম্পত্য কতটুকু নিষ্ঠুরতায় চলে তার বর্ণনা দিয়েছেন মানিক বন্দোপাধ্যায় উপন্যাসটিতে - "ক্যান মাঝি ক্যান, এত গোসা ক্যান? কলহ বে কই নিছিলা আমারে, চিরডা কাল ঘরের মধ্যে থাইকা আইলাম, এউককা লাইগা বেড়াইবার যাই যদি, গোসা করবা ক্যান? 'যা বেড়া গিয়া মাইজ কত্তার লগে– হারামজাদী, বদ।"[৭] তারপর দাম্পত্য কলহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। পাশবিক আচরণ উপন্যাসটি নতুন আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে "যদিও আধুনিকতা এবং বাস্তবতার রূপায়নকারী এই ঔপন্যাসিক। অরূপ কুমার ভট্টাচার্যের সাথে এক মত পোষণ করে বলতে হয়– "বাংলা সাহিত্যের মানিক বন্দোপাধ্যায়ের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় এই যে, তিনিই বাংলা কথাসাহিত্যে যথার্থ অর্থে বাস্তবতার প্রবর্তন করেন।"[৮]

পর্যালোচনাঃ

"আমাদের দুই বাংলার সাহিত্যে এখন পর্যন্ত আলোচিত আলোড়িত উপন্যাসগুলির মূল বিষয়বস্তু নিম্নের চারটির ১. পরকীয়া প্রেম। ২. আঞ্চলিক জীবন চিত্রণ। ৩. রাজনৈতিক আন্দোলন। ৪. সামাজিক শোষণ এবং সংগ্রাম। পরকীয়া প্রেম নির্ভর উপন্যাস বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইল থেকে শুরু। জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছে পরকীয়া প্রেম নির্ভর বেশীর ভাগ উপন্যাস। উদাহরণ স্বরূপ 'গৃহদাহ', ঘরে বাইরে', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'প্রজাপতি' প্রভৃতি উপন্যাস। আমাদের আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির মধ্যে এখনো শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'কর্ণফুলী', 'মহুয়ার দেশে', 'সারেং বউ' প্রভৃতি। রাজনৈতিক আন্দোলন নির্ভর উপন্যাস 'আনন্দ মঠ', 'গোরা', 'চরিত্রহীন', 'গণ- দেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'পথের দাবী', 'চিলে কোঠার সেপাই', 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড', 'রাইফেল রোটি আওরাত' প্রভৃতি । সামাজিক শোষণ এবং সংগ্রাম নির্ভর উপন্যাস পাচ্ছি- 'পল্লীসমাজ', 'লালসালু', 'সূর্যদীঘল বাড়ী', 'জননী', 'সংশপ্তক' প্রভৃতি।[৯]

> "এক সময় উপন্যাসে পরকীয়া প্রেমকে বিষয়বস্তু করা, ঔপন্যাসিকের কাছে ছিল আধুনিকতার সোপান। ফলে উপন্যাসে পরকীয়া প্রেম কম বেশী সব ঔপন্যাসিক গ্রহণ করেছেন। এখানে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি। নিষিদ্ধ ভালোবাসার বিষয় ঔপন্যাসিকের একটি এমন পরীক্ষাগার যেখানে সারা জীবনে তাদের একবার না একবার যেতেই হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অগুণিত এবং ও রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু সৃষ্টিকে এর প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা চলে। আনা কারেলিনা বা মাদাম বোভারি, চন্দ্রশেখর বা নষ্টনীড়- নিষিদ্ধ প্রেমই যেন ঔপন্যাসিকের বীক্ষণাগার - সত্যই বীক্ষণাগার, কেননা নিষিদ্ধ প্রেম বিষয়টির সঙ্গে উপন্যাসের মর্মসূত্রের একটি নিবিড় যোগ বিদ্যমান।"[১০]

দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ওলট-পালট করে দেয় পৃথিবী ব্যাপী অনেক কিছু। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন দর্শন নতুন মাত্রা লাভ করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে, তার ছোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষেও। পুরানো রীতিনীতি বিশ্বাসের সাথে নতুন বিশ্বাস সৃষ্টি করে দ্বন্দ্বের। এই সময়ের লেখক তারাশঙ্কর।"বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্কর বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী এবং বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কালের মতাদর্শ নিয়ে এক যুগসন্ধির সেতু নির্মাণ করেছেন। ধনতন্ত্র উদ্ভব হচ্ছে, সামন্ত তান্ত্রিক সমাজের বিলীন-পরিণতি, জমিদারতন্ত্রের ভগ্নদশা, ঈশ্বরে আস্তিক্যবোধে প্রগাঢ় বিশ্বাস, মার্কসীয় সাম্যবাদের সাথে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, হিন্দু-মুসলিম ধর্মের আলোকে প্রেম ও সমাজ জীবন, ফ্রয়ডীয় দর্শন, বর্ণবাদ, অন্তজশ্রেণীর জীবন-বীক্ষণ, অরণ্য-আকীর্ণ অঞ্চলের জনজাতির জীবন যাপন পদ্ধতি, শহর কলকাতার নাগরিক জীবন-সংকট ইত্যাদি বহুমুখী বিষয়ে তারাশঙ্করের জীবন-দর্শন নতুন মাত্রা লাভ করেছে। তারাশঙ্করের এই দর্শনগুলি বিশ্ববিখ্যাত কয়েকজন বিজ্ঞানীর তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কখনো বা তারাশঙ্কর সচেতনভাবে কখনো বা অবচেতন মনে গ্রহণ করেছেন তাদের মতবাদ। সিগমান্ড ফ্রয়েড, মার্কস মহাত্মাগান্ধী, ডারউইন, প্রচুর বিজ্ঞানীর তত্ত্ব, জিবাদ, জাতীয়তাবাদ, যোগ্যতমের বেচে হক। প্রস্তুতি মতবাদের উপস্থিতি ঘটেছে তারাশঙ্করের বিভিন্ন উপন্যাসে। কখনো কখনো পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি মতবাদের উপস্থিতি ঘটিয়ে বিশ্লেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ঔপন্যাসিক। এ সমস্ত মতবাদের অনেকগুলিই তারাশঙ্করের পঠিত বা মতবাদের জনক দ্বারা তারাশঙ্কর প্রভাবিত নয়। শুধুমাত্র মহাত্মাগান্ধীর জাতীয়তাবাদ বাদ দিলে আর কোনটারই প্রতি ব্যক্তি তারাশঙ্করের দুর্বলতা নেই বা তার প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি তারাশঙ্কর। পাশ্চাত্য বিভিন্ন মতবাদ তারাশঙ্করকে কখনো প্রভাবিত করে বিশ্বজনীন করে নিতে পারেনি বরং ভারতীয় ধর্ম, দর্শন দিয়ে তারাশঙ্কর বিশ্বকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।[১১]

"তারাশঙ্করের উপন্যাসে কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন চরিত্রসমূহ হচ্ছে চৈতালী ঘূর্ণী'র নায়ক গোষ্ঠ মণ্ডল, 'কালিন্দী' উপন্যাসের নায়ক অহীন্দ্র, 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ, 'মন্বন্তর' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সমূহ কানাই, নীলা সেন, বিজয়দা, নেপা প্রভৃতি। তারাশঙ্করের উপরোক্ত উপন্যাসগুলি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। 'চৈতালী ঘূর্ণী' তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস। 'কালিন্দী' তারাশঙ্করের প্রথম আলোড়িত উপন্যাস, 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম, 'মন্বন্তর' তারাশঙ্কর সৃষ্ট সাহিত্যে

একটি ব্যতিক্রমধর্মী রচনা। মার্কসবাদের নাস্তিক্যতত্ত্ব ব্যক্তি তারাশঙ্করকে সুচের মতো বিদ্ধ করত। কিন্তু তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণির' নায়ক সর্বহারা চাষী গোষ্ঠর মুখে শুনি, 'কি হবে ভগবানকে ডেকে? ভগবান নাই, নইলে একজন অট্টালিকায় ঘুমায় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে বাদলে মরে?' গ্রামের সদগোপ চাষী গোষ্ঠ মণ্ডল জমিদার এবং মহাজনের শোষণ অত্যাচারে জমি থেকে উৎখাত হয়ে শহরে আশ্রয় নেয়। সেখানে ধান কলে মজুর হয়। কলে ওভারটাইম আর মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে মজুররা। মজুররা ইউনিয়ন বানায়, গোষ্ঠও ইউনিয়নে যোগ দেয়। উনিশ দিন পর পেটের জ্বালায় কিছু শ্রমিক ধর্মঘট ভাঙ্গার উপক্রম করলে দুই দলে দাঙ্গা লাগে। আহত হয় গোষ্ঠ, পরে হাসপাতালে মারা যায়-এ হচ্ছে 'চৈতালী ঘূর্ণী'র কাহিনী। প্রায় একযুগ পরে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' উপন্যাসেও দেখানো হয় কিভাবে কৃষক পেশা থেকে উৎখাত হয়ে কারখানায় মজুর হয়ে যাচ্ছে। বামপন্থীরা তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণী'তে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার লক্ষণ খুঁজে পেয়েছিলেন। ১৯২৯ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৩০ সালের এপ্রিল (চৈত্র ১৩৩৬) এই ছয় মাসে 'চৈতালী ঘূর্ণী' উপন্যাস পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ সালে সমগ্র ভারতবর্ষ শ্রমিক আন্দোলনে তোলপাড় হয়। এই ধর্মঘটে যোগ দেয় শুধু বাংলাদেশের ১,২৬,৫৭৫ জন শ্রমিক, 'চৈতালী ঘূর্ণী, শ্রমিক জাগরণ মূলক উপন্যাস। 'চৈতালী ঘূর্ণী'র শ্রমিক আন্দোলন ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' (১৯০৬) উপন্যাসের কথা স্মরণ করায়। এ উপন্যাসে যে সমাজনিরীক্ষণ তার সঙ্গে মার্কসবাদের অনেক বেশী সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু ১৯৫৩ সালে এসে তারাশঙ্কর বলেছেন, "এ নিয়ে (চৈতালী ঘূর্ণীর সূত্রে) অনেকে আমাকে মার্কসবাদে প্রভাবান্বিত বলে ঠাউরেছেন। কিন্তু মার্কসবাদের ক্যাপিটাল বা তাঁর লেখা কোনও বই আমি পড়িনি।... আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তা থেকেই আমি আমার উপলব্ধি সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম।"[১২]

'মন্বন্তর' (১৯৪৪) তারাশঙ্করের বিতর্কিত উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক কানাই সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। নায়িকা নীলা ও তার ভাই নেপী সাম্যবাদী কর্মী। তাদের বিজয়দাও কমিউনিস্ট। এরা পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুর্যোগময় প্রেক্ষাপটে মানুষের সেবায় লিপ্ত হয়। এই চরিত্রগুলি মহৎ। এ উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট হিসাবে আমরা তারাশঙ্করের বক্তব্য শুনি- "মন্বন্তর প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলার আছে।... ১৯৪২ সনের মার্চ বা এপ্রিলের একদিন সজনীকান্তের মোহন বাগানের আপিসে সন্ধ্যার মুখে আড্ডা জমেছে। বসে আছি, এমন সময় এলেন শ্রীরামপুর বনফুল সাহিত্য সমিতির স্নেহাস্পদ শ্রীঅমিয় গঙ্গোপাধ্যায়। অমিয় তখন ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্টে কাজ করতেন। তিনি সজনীকে বললেন, চলুন, শুনলাম গণেশ আভিন্যুতে 'পূর্বাশা' আপিসে একটি সাহিত্যিক আলোচনা সভা আছে। আলোচনার বিষয়- যুদ্ধকালীন সাহিত্য, শুনলাম প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, মানিক, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ সকলেই আসবেন। আমার নিমন্ত্রণ ছিল না সজনীর অনুরোধে এবং অনেকের সঙ্গে দেখা হবে এই আকর্ষণে বিনা নিমন্ত্রণেও গেলাম।... সেখানে সত্য বলতে আলোচনা খুব সরল বা প্রাঞ্জল হল না। শুধু সজনীকান্ত সোজা ভাষায় বললেন, যুদ্ধকালীন সাহিত্য মানে ইংরেজ সরকারের বরাতী সাহিত্য; সোজা কথায় কিছু অধার্গম, অর্থাৎ এককথায় বাতিল করে দিলেন। কথাটার মূলে ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্ট সম্পর্কে ইঙ্গিত ছিল। তখন ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্ট থেকে কতগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের রচনা ছিল। কথাটা আমার অসঙ্গত মনে হল। কয়েকজন স্বেচ্ছায় প্রচারকার্য করেছেন বলে এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যে দেশের এই নিদারণ অবস্থা নিয়ে সাহিত্য রচনা হয় না। এ কেমন কথা, সর্বশেষে সেই কথাই বললাম। ফেরার পথে মনের মধ্যে 'মন্বন্তর' রচনার বীজটি নিষিক্ত হয়ে গেল। লিখতে শুরু করে দিলাম।...যুদ্ধের প্রভাবে সমাজে বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলে যে সর্বনাশা বিকৃত ক্ষুধা কুম্ভকর্ণের রূপ নিয়ে উঠেছে এবং অন্য দিকে দরিদ্র মানুষ ক্ষুধার দায়ে অসহায় ভাবে যে আত্ম বিক্রয় করছে সেই কথাটাই বলবার কথা ছিল। এই পটভূমিতে পড়ন্ত ধনী ঘরের বিকৃত রূপ যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্চিত হতে চলেছে একদিকে, অন্যদিকে বাঁচবার চেষ্টায় একাংশ প্রাণপণে চেষ্টা করছে, ছেলেটি ছিল কম্যুনিস্ট, স্বাভাবিকভাবে তখন প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা সবই ছিল কম্যুনিস্টদের হাতে। এইটাই চোখে সেদিন দেখেছি। তারা সেদিন যে তৎপরতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন তার প্রশংসা শ্রীযোশীর কাছে লেখা পত্রে করেছি, আজও করছি। বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এদের কর্মীরা। সে সময় সেটাই আমাকে মুগ্ধ করেছিল।"[১৩]

'আরণ্যক' উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলি কতটা দরিদ্র তার দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক লেখকের বর্ণনা থেকে। সত্যচরণের ভাষায় "পাটোয়ারী বলিলাম- এ সব লোকেই কি ইজারা ডাকবে? পাটোয়ারী বলিল-না হুজুর এর খবর লোভে এসেছে। আপনার আসবার নাম শুনে আজ পুলিশ করে কাছারিতে এসে বসে আছে। এদেশের লোকের এই রকম অভ্যেস। আরো অনেকে বোধ হয় কাল আসবে। এমন কথা কখনো শুনি নাই। বলিস কি! আমি তো নিমন্ত্রণ করিনি এদের? ওজুর এরা বড় গরিব; ভাত জিনিসটা খেতে পার না। কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাত্র এই এরা বারো মাস খায়।" এই রকম আরো বর্ণনা যেমন- "এখানে এত লোক এসেছে কেন তেওয়ারীজি? -হুজুর, সবাই বললে ফুলকিয়ার কাছারিতে ম্যানেজার এসেছেন, সেখানে গেলে ভাত খেতে পাওয়া যাবে, তাই ওরা এল, ওদের সঙ্গে আমিও এলাম। -ভাত এখানকার লোকে কি খেতে পায় না? -কোথায় পাবে হুজুর। নউগচ্ছিয়ার মাড়োয়ারীরা রোজ ভাত খায়, আমি নিজে আজ ভাত খেলাম বোধ হয় তিন মাস পরে। গত ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল, সে বড়লোক ভাত খাইয়েছিল। তারপর আর খাইনি। যতগুলি লোক আসিয়াছিল, এই ভয়ানক শীতে কাহারো গাত্রবস্ত্র নাই, রাত্রে আগুন পোহাইয়া রাত কাটায়। শেষরাত্রে শীত যখন বেশি পড়ে, আর ঘুম হয় না শীতের চোটে-আগুনের খুব কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকে ভোর পর্যন্ত।"[১৪]

"আরণ্যকের সমাজ সময়ের তুলনায় হাজার বৎসর পিছিয়ে আছে, কিন্তু এত পিছনে পড়ে থাকা সমাজের চিত্র তৈরিতে ঔপন্যাসিক কোথাও অসংগতি তৈরি করেননি। রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন 'ভোলগা থেকে গঙ্গায় (১৯৪৪) খ্রিস্টপূর্ব সময়ে মধ্য এশিয়া বা উত্তর ভারতের মানুষের খাদ্য সংগ্রহে যে দূরহ সংগ্রাম চিত্র তৈরি করেছেন, বিভূতিভূষণ অনেকটা কাছাকাছি চিত্র তৈরি করেছেন দুই সহস্রাধিক বছর পরের ব্রিটিশ রাজের সাম্রাজ্যে। বাংলা উপন্যাসে প্রকৃতির সীমাহীন প্রাধান্য দিয়েছেন বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'হে অরণ্য কথা কও', 'বনে পাহাড়ে' প্রভৃতি গ্রন্থে। এসব গ্রন্থে তো বটেই, বিভূতিভূষণের অন্য উপন্যাসগুলিতেও প্রকৃতি তার অবস্থান জানিয়ে দেয়। ব্যক্তিজীবনেও বিভূতিভূষণ ছিলেন অরণ্যপ্রেমী। ব্যক্তি বিভূতিভূষণ তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন-"আমি বোধ হয় পূর্ব জন্মে ছিলাম উষ্ণ অরণ্য-প্রদেশের একটি ম্যাকাও পাখি হয়ে। মানুষের বাস যেখানে ঘিঞ্জি সেখানে আদৌ মন টেকে না কেন কি জানি। 'I am most happy. When I am in a lonely primeval forest' 'আরণ্যক' বিভূতিভূষণের বহুল আলোচিত উপন্যাস এই আলোচনা সমালোচক ভেদে সমান গুরুত্ব পায়নি। এমনও প্রশ্ন উঠেছে আরণ্যক আদৌ উপন্যাস কিনা? সামসুনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা হয় 'হাঙ্গার' এবং 'প্যান'কে। হাসনের 'গ্রীন লেসন'কে বলা হয় ওয়ার্ল্ড পপুলার ক্লাসিক। হেনরী, থোরো'র 'ওয়াল্ডেন' ও অসাধারণ সমাদৃত। কিন্তু আমরা কোনো মতেই 'আরণ্যক'কে খাটো দেখতে পারি না। মূলত প্রকৃতি- সচেতন শিল্পী বিভূতিভূষণের গন্তব্যস্থল 'আরণ্যক' আর তার যাত্রা শুরু 'পথের পাঁচালী'র মাধ্যমে। মধ্যে যাত্রা পথে পেরিয়েছেন 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ'। প্রকৃতির সৌন্দর্য, বন জঙ্গল, পাহাড় টিলা, গাছপালা, বনের প্রাণী, সঞ্জ, বনজ ফুল, নিস্তব্ধ রাত্রি, জ্যোৎস্নালোক, ঝরনা, ধূ- মাঠ, এসব বিভূতিভূষণের নিজের জগৎ, স্বক্ষেত্র, ঠিকানা। 'আরণ্যক' উপন্যাসে তিনি গন্তব্যস্থলে পৌঁছান, লাভ করেন পরিপূর্ণতা।"[১৫]

"বিভূতিভূষণের (১৮৯৪-১৯৫০) 'আরণ্যক' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। এর আগে অরণ্য নিয়ে 'আরণ্যক'-এর সমতুল্য আর একটি উপন্যাসও বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হয়নি। এমন কি বিশ্ব-সাহিত্যে অরণ্য নিয়ে শিল্প-সফল উপন্যাস ছিল মাত্র তিনটি। নরওয়েজীয় লেখক নাট হামসন (১৮৫৯- ১৯৫২)। উইলিয়াম হেনরী হাডসন (১৮৪১- ১৯২২) 'Green Mansions' এবং মার্কিন লেখক হেনরি ডেভিড থরো(১৮১৭-১৮৬২) 'Walden'। হেনরি ডি. থরো ১৮১৭ সালের জুলাইতে ম্যাসাচুয়েটস এর কনকর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকার কনকর্ড একটি আকর্ষণীয় স্থান এবং স্বভাবতই এর প্রভাব হেনরি এড়াতে পারেননি। শহুরে যান্ত্রিক জীবন থেকে পালিয়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপক তৃষ্ণা ছিল তাঁর। 'Walden' (ওয়ালডেন)-এ এরই প্রমাণ মেলে"[১৬] "হেনরি থরো ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ, যা অন্যের নজর কাড়ার মতো নয়। তিনি খ্যাতিমান, জনপ্রিয় কিংবা আকর্ষণীয় ছিলেন না। অথচ তাঁর চিন্তাশক্তি পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠত। জীবনের তাৎপর্য অনুসন্ধানে তিনি ছিলেন তৎপর। তিনি ভাবতেন, মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি বিলাসিতাকেও অপরিহার্য মনে করে কেবল অর্থের পিছনে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু প্রকৃতই তারা জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। দীর্ঘসময় ধরে

জীবিকার চাকায় তেল ঢালতে ঢালতে তারা নিজেরাই যন্ত্র হয়ে যায়। হেনরি তাঁর জীবনকে ভোগ করেছেন পুরোপুরি। জীবনের দাসত্ব তিনি কখনো মেনে নেননি। দীর্ঘপথ হাঁটতে হাঁটতে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের নিত্যমেলা, পাখির কলতান, বাতাসের ধ্বনি আর প্রকৃতির স্বাধীনতায় তন্ময় হতে হতে তাঁর দিন কেটেছে। তিনি খুব দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, শহুরে জীবন বোকাদের স্বর্গবাসের মতো। সম্ভবত তাঁর এই আত্মজিজ্ঞাসা তাঁকে পরবর্তীকালে খ্যাতিমান করে তোলে। হাডসনের সাহিত্য থেকে বিভূতিভূষণ কতটা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন বোঝা যায়, আরণ্যক উপন্যাসে অরণ্যের সৌন্দর্যমুগ্ধ ঔপন্যাসিক যখন বলেন- "চারিদিকে চাহিয়া প্রকৃতির এই বিজন রূপলীলার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম--ভারতবর্ষে এমন জায়গা আছে জানিতাম না তো! এ যেন ফিল্মে দেখা দক্ষিণ আমেরিকার আরিজোনা বা নাভাজো মরুভূমি কিংবা হাডসনের পুস্তকে বর্ণিত গিলা নদীর অববাহিকা অঞ্চল।"[১৭]

কালোত্তীর্ণ হলে সগৌরবে পাঠকের মনে জায়গা করে নিয়েছে যে বাংলা সাহিত্যে বিদূষী সাহিত্যিকগণ। তাঁদের মধ্যে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের 'সুলতানার স্বপ্ন' সৃষ্টি কর্মের দিক থেকে অনন্য দর্শন। পাঠক সমাজে বিস্ময় তৈরি করে। মুসলিম ঔপন্যাসিকদের আগমন বিলম্বিত হলেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মীরমশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯২০) এর 'বিষাদ সিন্ধু', যুগ যুগ ধরে পাঠকের হৃদয়ে বেদনার উৎস হয়ে আছে। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) উপন্যাস রচনা করে স্বীয় বৈশিষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। 'বাঁধন হারা', 'কুহেলিকা' ও 'মৃত্যুক্ষুধা' সাধারণ মানুষের জীবন চিত্রের মধ্যে অসাধারণ বিপ্লবীদের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৫- ১৯৭৪) 'অবিশ্বাস্য', 'শবনম', সহজ, মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্য ধারার পরিচায়ক। একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের রূপান্তর চলছে।

উপসংহার:

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের উপন্যাস যখন গদ্যের গর্বে তখন ইউরোপ জুড়ে আলোচিত হচ্ছে "Art for arts sake" থিওফিল গতিয়ে, গাই দে মোঁপাসা (১৮৩৫) উপন্যাসের মুখবন্ধে এ কথা বলেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন কি ফারসী, কি ইংরেজী সাহিত্যে "Art for arts sake" এ কথা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। সামাজিক, রাজনৈতিক বা নৈতিক শিক্ষার জন্য শিল্প নয়, শিল্প একান্ত সৌন্দর্যের বিষয়, শিল্পের খাতিয়ে শিল্প, গতিয়ের এই মতবাদ প্রভাবিত করে বোদলেয়ার, ফ্লোবেয়ার, অস্কার ওয়াইলড প্রমুখ সাহিত্যিকদের। আধুনিক উপন্যাসে বিশ্লেষকদের দাবী জীবন দর্শন। দস্তইয়েভস্কি 'ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট' শেষ সিদ্ধান্ত দেয় পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। কিংবা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সি' পাঠকের কানে চুপি চুপি বলে 'মানুষকে ধ্বংস করা যায়, কিন্তু পরাজিত করা যায় না। টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' বর্ণনা করে যুদ্ধ এবং শান্তি। বিশ্ব সাহিত্যের আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গির এসব সার্থক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের নতুন প্রজন্মের আকৃষ্ট করলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শামিল হওয়ার উপন্যাস চোখে পড়ে না। দুই বাংলার ঔপন্যাসিকরা আঙ্গিক নিয়ে বৈচিত্র্যের জোয়ার তুললেও ব্যতিক্রমী বিষয়কে উপন্যাসের কাঁচামাল করতে পারেন নি। মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশ বিভাগ, দাঙ্গা, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যান্ত্রিক সভ্যতা অনেক বিষয়ই পরবর্তীকালের উপন্যাসের বিষয় হয়েছে। কিন্তু বিষয়গুলির উপস্থাপন খুব সরল বলে আলোড়ন তুলতে ব্যর্থ হয়। গভীর জীবনদর্শন অনুপস্থিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আধুনিকতায়, আমাদের উপন্যাসে এখনও পিছিয়ে রয়েছে। উপন্যাস গবেষকদের ইদানিং দাবী 'ঘটনা নয়, জীবনকে চাই, বস্তু নয় লেখকের মনকে চাই, গল্প নয়, জীবন রহস্যকে জানতে চাই"[১৮]। তাই জীবনের মূল্যবোধকে অনুশীলন করে উপন্যাস সমৃদ্ধি করলেই পাঠককে প্রাপ্যতা আশানুরূপ হবে।

তথ্যসূত্র:

১। ইসলাম, আজহার। বাংলা সাত্যের ইতিহাস আধুনিক যুগ। অন্যান্য, ৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০ পৃ. ১৪৮।

২। চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ। কলিকাতা: এম সি সরকার এন্ড প্রাইভেট লিমিটেড, দশম সম্ভার ২০০০, পৃ. ৩৭০।

৩। সিকদার, অশ্রু কুমার। আধুনিকতা ও বাঙলা উপন্যাস। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রি. পৃ. ১।
৪। বন্দোপাধ্যায়, সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। কলকাতা: দে'জ, নভেম্বর ১৯৯৫ খ্রি, পৃ. ১৮৫।
৫। বন্দোপাধ্যয়, মানিক। পুতুল নাচের ইতিকথা: এক বৃহদায়তন উপন্যাসের জৈবনিক বিস্তার। ঢাকা: অধিকার, আফসার ব্রাদার্স সংস্করণ, ২০২০, পৃ. ১০।
৬। সরকার, আবদুল মান্নান। উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ২৫৫।
৭। মামুদ, হায়াৎ সম্পাদিত। মানিক বন্দোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা, ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ১৮৯।
৮। সরকার, আবদুল মান্নান। উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩, পৃ. ৩৯২।
৯। ভট্টাচার্য, অরূপ কুমার। আঞ্চলিকতা ও বাংলা উপন্যাস। কলকাতা: পুস্তক বিপনী, বৈশাখ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৬।
১০। বন্দোপাধ্যায়, সরিৎ। আমার পিতা তারাশঙ্কর। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনী, কার্তিক ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১২০-১২১।
১১। ডালিম, শফিউল আযম। আধুনিক উপন্যাস: উপন্যাসের আধুনিকতা। পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৭৫।
১২। পূর্বোক্ত, উপন্যাসের আধুনিকতা পান্ডুলিপি, পৃ. ৭৩।
১৩। শফিউল আযম ডালিম, বিজ্ঞানীর তত্ত্ব: তারাশঙ্করের উপন্যাস, পাণ্ডুলিপি, বিংশ খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭।
১৪। ডালিম, শফিউল আযম। তারাশঙ্করের উপন্যাসে সাম্যবাদী চরিত্র। কলিকাতা: কথাসাহিত্য, আশ্বিন ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৮-৩৯।
১৫। পূর্বোক্ত, তারাশঙ্করের উপন্যাসে সাম্যবাদী চরিত্র পৃ. ৩১।
১৬। পূর্বোক্ত, তারাশঙ্করের উপন্যাসে সাম্যবাদী চরিত্র, পৃ. ৪০-৪১।
১৭। বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ সম্পাদিত। আমার লেখা। প্রবন্ধ অভিভাষন ও পত্র সংকলন, কলকাতা কথাসাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৫ খ্রি, পৃ. ৩০।
১৮। আহমদ, ড. শফিউদ্দিন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সমগ্র। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ১৯৯২ খ্রি, পৃ. ৯।